Vol. 9 | No. 1 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও পরবর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বৌদ্ধ গান ও দোহার প্রভাব

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.4
Pages	39-54
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও পরবর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার প্রভাব

নীলিমা ইব্রাহিম

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্বিদের মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি অষ্টম শতাব্দীর আগে নয়। ১৯০৭ সালে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবার থেকে 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়' বা চর্যাপদের পুঁথি প্রাপ্ত হন। ভাষাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের সামনে বাংলা ভাষার ইতিবৃত্তের এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। এ ভাষা ও লিপির রচনা কাল নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঝড় উঠলো, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, ডঃ সুকুমার সেন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন যুক্তি তর্ক থেকে মোটামুটি এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে এ পদগুলির রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। অবশ্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে একালের ব্যাপ্তি আরও দূর প্রসারী অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে এর রচনা কাল সুরু হ'য়েছে।

সিদ্ধাচার্যগণের আবির্ভাব কাল এবং তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে নানা মতভেদ রয়েছে। যেমন তিব্বতী সিদ্ধাচার্যগণের তালিকায় শান্তিদেবকেই 'ভুসুকু' নামে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু চর্যাপদের পদগুলিতে এই অভিন্নতার সপক্ষে কোনও বিশেষ যুক্তি বা প্রমাণের উপকরণ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ বলেছেন, "তারানাথ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে এক ভুসুকুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সময় খ্রীস্টিয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে। খুব

সম্ভব ইনিই চর্যাপদের ভুসুকু। তাহা হইলে শান্তিদেব ভুসুকু এবং চর্যারচয়িতা ভুসুকু উভয়ে পৃথক ব্যক্তি। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ভুসুকুর নামকরণ প্রথম ভুসুকুর নাম হইতেই হইয়াছে।' এ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত 'কাজেই ভুসুকু এই বাঙ্গালা দেশেরই এক প্রাচীন কবি, যেমন তাঁহার গুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশ এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য।'

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের আদি সিদ্ধাচার্য লুই পাদের সময় নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন 'লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছিলেন। দীপঙ্কার-শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।' এ উক্তিকে গ্রহণ করলে আমরা চর্যাপদের রচনাকাল দশম শতাব্দীর শেষে অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম বলে গ্রহণ করতে পারি।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ ক্ষেত্রে পৃথক মত পোষণ করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনীকে গ্রহণ করে তিনি বলেছেন যে লুইপাদের কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী। তাঁর এই মত প্রতিষ্ঠায় তিনি নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্যগণের ধর্মমত ও তাঁদের ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দের উল্লেখ করে সহজিয়াদের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে চর্যাপদগুলির রচনা কাল সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে। ডঃ সুকুমার সেন এ মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও তাঁহার অনুবর্তীরা বলেন লুইপাদ প্রভৃতি প্রাচীনতর সিদ্ধাচার্য খ্রীস্টিয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মত মানিলে স্বীকার করিতে হয় যে সপ্তম-অষ্টম হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত চারি পাঁচশত বৎসর ধরিয়া চর্যাগীতির ভাষায় কোনই পরিবর্তন হয় নাই। চর্যাগানের শৈলীর প্রাচীনত্ব মানিয়া লইলেও বাঙ্গালা ভাষায় এই অবস্থায় এ ব্যাপার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।' ডঃ শহীদুল্লাহ্ এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং ডঃ সুকুমার সেন প্রভৃতির মতের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে এর রচনা কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ধরা যেতে পারে। কারণ পদগুলি একই সময়ে তো রচিত নয়ই, উপরন্তু গুরু-শিষ্যের দুপুরুষের

স্তর অতিক্রম করে তার রচনা কালের ব্যাপ্তি আরও অধিক বলেই ধরা যেতে পারে। তবে ভাষার উদ্ভব যুগে কালের ব্যবধানের ছাপ যতোখানি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল, তার বিশেষ কোনও ছাপ আমরা এ পদগুলিতে পাই না। প্রথম পদটি লুইপাদের রচিত বলে একে পদসঙ্কলনের প্রথমেই স্থান দেওয়া হইয়াছে, এ বিশ্বাস অধিকাংশ সাহিত্যের ঐতিহাসিকই পোষণ করেন। সঙ্কলনের শেষ পদটি পাই সবর পাদের; তিন পুরুষ বা ততোধিক দূরত্বের কোনও স্পষ্ট ছাপ উভয়ের ভাষা বা রচনা শৈলীতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অবহট্‌ঠের প্রভাবে কোনও ভাষাই তখন পৃথক প্রাদেশিকতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে দ্রুত অগ্রসর হতে পারছিল না। তবে পদগুলির ভেতর অবহট্‌ঠের প্রভাবের কিঞ্চিদধিক তারতম্য আমাদের চোখে পড়ে, যদিও এ ব্যবধান বা তারতম্য কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়নি, যাতে একে পৃথক স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

এ পুঁথি আবিষ্কারের পর আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ পদগুলিকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বাংলা গান ব'লে ঘোষণা করলেও এর দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। চর্যাপদে ব্যবহৃত বিশেষ পারিভাষিক শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং নানা অলঙ্কার প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে এ পদগুলির বাহ্যিক অর্থসম্পন্ন চিত্রধর্ম ছাড়াও এর অন্তরে একটি বিশেষ তত্ত্বপূর্ণ ধর্মীয় সত্য নিহিত আছে। এজন্য বৃত্তিকারেরা এই দ্বৈত অর্থ লক্ষ্য ক'রে এ ভাষার নাম দিয়েছেন 'সন্ধ্যাভাষা', পদকে বলেছেন 'সন্ধ্যাবচন' আর অন্তর্নিহিত ভাবকে বলেছেন 'সন্ধ্যা সংকেত' বা শুধু 'সন্ধ্যা'। এ প্রকাশ-ভঙ্গীর ও নামকরণের ওপর নির্ভর করে আচার্য শাস্ত্রী বলেছেন—'সহজিয়া ধর্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো আঁধারির ভাষা — কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' ডঃ সুকুমার সেন এই মতকে খণ্ডন করে বলেছেন যে দিবারাত্রির মোহনার সঙ্গে এ ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। 'ধ্যৈ' ধাতুর অর্থ এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান। সুতরাং বিশেষ অর্থ-বিশিষ্ট অথবা ধ্যানের ভাষা বলেই একে 'সন্ধ্যা ভাষা' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় অবশ্য এর দুর্বোধ্যতা ও অর্থ-কাঠিন্য দেখে এর সঙ্গে সন্ধ্যার আলোছায়ার কথাই সহজে স্মরণ করেন। সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী রসিক পাঠকের পক্ষে এর মর্মোদ্ধার করা কোনও রকমেই সম্ভব নয়। বহু তর্ক বিতর্ক এবং প্রমাণ বিচার দ্বারা ভাষা বিজ্ঞানীরা এর বাঙ্গালীআনা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবুও এর পদগুলির ভেতর এমন কতকগুলো অংশ আছে যা পাঠ ক'রে বাঙ্গালী মাত্রেই বলতে পারে যে এ ভাষা তার নিজস্ব। সম্ভবতঃ প্রথম পাঠে এ সব অংশই পণ্ডিত শাস্ত্রীকে অতোখানি বলিষ্ঠ কণ্ঠ দান করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য এ পদগুলির রচনা কালে সমস্ত আর্যভারতীয় ভাষার ওপরই অবহট্‌টের প্রভাব প্রচুর পরিমাণেই ছিল। এজন্যে নিকটবর্তী প্রদেশগুলি বা ভূখণ্ডগুলির ভাষাতে সমধর্মী ও সমরূপী পদ ও রচনা শৈলীর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এসব কারণেই চর্যাপদ গুলির বহু দাবিদার পাওয়া গিয়েছিল। আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী সব ভাষাই একে আপন সম্পদ রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। অবশ্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থে বাংলা ভাষার দাবিকেই যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন।

পরবর্তী কালের বাংলা ভাষার বহু বৈশিষ্ট্যই চর্যাপদে বর্তমান। ভাব, ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, পদ-গঠন-রীতি সর্বস্তরেই চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলি প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করবো। সর্বপ্রথম চর্যাপদের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত ক'রছি, তার বাঙ্গালী-আনা আমাদের কষ্ট ক'রে প্রমাণ করতে হবে না। যেমন :

'সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই' [লুইপাদ, পদ সংখ্যা—১]
(সুখ দুঃখেতে নিশ্চিত মরিবে)

এখানে এ পংক্তিটির অর্থোদ্ধার করতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না।

অন্যত্র 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' [ভুসুকু পাদ, পদ সংখ্যা—৬]

এ ছত্রটি এমনি অবিকৃত অবস্থাতেই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ক'রে মঙ্গল কাব্যে বহু জায়গাতেই ব্যবহৃত হয়েছে।

ভুসুকু অন্যপদে বলেছেন ঃ

'আজি ভুসুক বাঙ্গালী ভইলী।' [ভুসুকু পাদ]

ভুসুকু পাদ নিজে বাঙ্গালী ব'লে পৃথক পরিচয় না দিলেও তাঁর বাচন ভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি বাঙ্গালী। ভুসুকুর অন্যপদে পাই ঃ

'মাআ জাল পসরি রে বধেলী মাআ হরিণী' [পদ সংখ্যা ২৩]

(মায়া জাল অপসারিত ক'রে আমি মায়া হরিণীকে বধ করেছি)

মায়াজাল, মায়াহরিণী ইত্যাদি পদ বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব কাব্য ও ছন্দময় শব্দ সম্ভার। কৃষ্ণাচার্য বলেছেন ঃ

'মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী।' [পদ সংখ্যা ১১]
(শাশুড়ীকে মেরে, ননদ কে ঘরে বন্ধ করে, মাকে
মেরে কৃষ্ণাচার্য কাপালিক হয়েছেন।)

শাশুড়ী, ননদ, শালী, মা এঁরা আমাদের অতিপরিচিত নিকট সম্বন্ধের মধ্যে এবং আজও বাঙ্গালীর ঘরে এঁরা এই নামেই অভিহিত হ'য়ে থাকেন। সুতরাং এ চরণ দু'টির ভাষা বাংলা কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে না অথবা পণ্ডিতি বিতর্কের অবকাশ আছে বলেও মনে হয় না।

সরহপাদ বলেছেন ঃ

'নৌবাহী নৌকা টানঅ গুনে' [পদ সংখ্যা ৩৮]

(নৌ বাহক বা মাঝি গুণ টেনে নৌকা বেয়ে যায়)

ডোম্বী পাদ, সরহ পাদ, কাহ্ন পাদ, মহিণ্ডা পাদ, ভুসুকু পাদ ইত্যাদি অনেকের পদেই এমন স্বচ্ছ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার পরিচয় আমরা পাই।

চর্যাপদের পদ কর্তাদের রূপ কল্পনায় ও ভাব প্রকাশে বহু ক্ষেত্রেই আমরা পরবর্তী সাহিত্যকর্ম শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাই। বাংলা ভাষার

ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা ভাষার আদি বা প্রথম স্তর এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনকে মধ্য স্তরের প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন। ভাষা জগতে ও ভাষা প্রয়োগেও উভয়ের ভেতর বহু স্থানেই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

শবর পাদের অঙ্কিত কাব্য চিত্রে পাই অপরূপ লাবণ্যবতী শবরী বালিকা ঃ

উচাঁ উচাঁ পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জমালী॥ [পদ সংখ্যা ২৮]

[শবরী বালিকা উচু উচু পাহাড়ে বাস করে, তার পরিধানে ময়ূর পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা]

বড়ু চণ্ডীদাসও এই একই রীতিতে তাঁর আরাধ্য নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে সাজিয়েছেন ঃ

ময়ূর পুচ্ছে বান্ধি চূড়া কেশ পাশে দিআঁ বেড়া
কনয়া কুসুমে বাঁধি জটা।

কাপালিকের রূপ বর্ণনায় তার দেহে অলঙ্কার সমাবেশ করা হয়েছে। সাধন তত্ত্বের গুহ্য মর্মার্থ ধারণ করে পদ কর্তা বলেছেন ঃ

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে, [পদ সংখ্যা ১১]
(আলি কালি চরণের ঘণ্টা নূপুর)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাধিকা বিরহে জর্জরিতা তনু অভিমানভরে অঙ্গ সজ্জা পরিত্যাগ করতে চাইছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবীর অলঙ্কারও ঐ একই রীতির ঃ

'তেজিলোঁ। মো চীর নূপুর কঙ্কণ বড়ায়ি,
তেজিলোঁ। মো সব আভরণে।'

এ সাদৃশ্য শুধু দেহগত নয়, এ মিল কবি আত্মায়, তাঁর সৌন্দর্য চেতনায়, ভাব সম্পদে, রূপকল্প সৃষ্টিতে। আর্যদেবের পদে পাই ঃ

'ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার' [পদ সংখ্যা ৩১]
(ভয় ঘৃণা ও লোকাচার ছেড়েছি)

নৈরাত্মাকে পাবার জন্য, পরমার্থ লাভের আশায় সাধক সর্ব প্রকার লৌকিক অনুভূতি ইন্দ্রিয়জ চেতনা থেকে মুক্ত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের চন্দ্রাবলী লোকাচারে বন্দিনী। কৃষ্ণকে পাবার পথে তাঁর বাধা কুলাচার। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে মহামিলনের আকাঙ্ক্ষায় এ বাধা তুচ্ছ। তাই বড়ু চণ্ডীদাসের রাধিকা বলেছে :

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি, না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।'

কালের দুস্তর বাধা এবং কয়েক শতাব্দীর কৃষ্ণযবনিকার স্তর অতিক্রম করেও এ ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

চঞ্চলা চতুরা নৈরাত্মা দেবীকে কৃষ্ণাচার্য সহজ আয়ত্তের ভেতর আনতে না পেরে বলেছেন :

'ডোম্বীত আগলি নাহি ছিনালী' [পদ সংখ্যা-১৮]
(ডোম্বী তোমার চেয়ে অগ্রগণ্যা দুষ্ট প্রকৃতি আর কেউ নেই।)

ছলনাময়ী রাধিকাকে বাঁশী চুরি করে অপরাধ অস্বীকার করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহি তোরে।
তোঞ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাঁসলীর বরে।

এখানে কর্মচণ্ডালিনী নৈরাত্মা দেবীর প্রতি সাধক কবি যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন, পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবির সে শব্দ প্রয়োগ একই অর্থে বাঙময় হয়ে উঠেছে। ঢেণ্ঢণ পাদের পদে পদকর্তা স্ব-অবস্থানের কথা রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন :

"টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী।" [পদ সংখ্যা-৩৩]
(টিলার ওপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই,
হাঁড়ীতে ভাত নেই, নিত্য উপবাসী।)

বাংলার সমাজ জীবনের এই নিঃস্ব সর্বহারা রূপ পরবর্তী কালের কবি স্থান ও কালের বহু স্তর অতিক্রম করে একই মর্ম বেদনায় ব্যক্ত করেছেন, কবি কঙ্কণের কাব্যে নায়িকা ফুল্লরা যখন দেবীর সামনে তার দুঃখের পসরা তুলে ধরেছেন, তখনও আমরা ঠিক অমনি একটি নিঃস্ব পরিত্যক্ত, দারিদ্র্য জর্জরিত দেহও আত্মার ক্রন্দন শুনতে পাই ঃ

কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান
লঘু বৃষ্টি কুড়াতে সদাই বহে বান।

বাংলা দেশ চিরকালই দরিদ্র, জনসাধারণ বঞ্চিত, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও অন্ত্যজ শ্রেণীর অর্থ নৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত।

কৃষ্ণাচার্য, অসম্প্রদায়ভুক্ত যোগীদের অজ্ঞানতাকে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

মূঢ়া দিঠ নঠ দেখি কাঅর [পদ সংখ্যা-৪২]
(মূর্খেরা দৃষ্ট বস্তু নষ্ট দেখে কাতর হয়)

মূর্খের ও দুষ্টের চরিত্র সর্বকালেই এক প্রকার। তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনা। মায়া, মোহ, ছলনাই তাদের সম্বল। শ্রীমতী তাই কৃষ্ণের কাছে বড়াইএর গুণ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

দুঠ মন মিছ দেখে আত্মসম পর লেখে
চাহা বাঁশী তাহার মুরারি'

এমনি ভাবেই ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি স্তরের পর স্তর অতিক্রম ক'রে চলেছে। বৌদ্ধগান ও দোঁহার ভাব ও ভাষার স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমৃদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ছোঁওয়া পাই মঙ্গল কাব্যে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি বাল-গোপালের দুঃখে বিগলিত হয়ে বলেছেন ঃ

'হা-কান্দ করুনা করেঁা ভূমিত লোটায়িআঁ'।

পরবর্তী কালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরা সুন্দরী তার কুঁড়ে ঘরে দেবীকে দেখে কপালে আঘাত হেনেছে ঃ

'হা-কান্দ কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর।'

অবশ্য এর পরবর্তী কালের কাব্য সাহিত্যের নায়ক নায়িকারা হাহাকার করেই কাঁদে। 'হা-কান্দ' শব্দে তাদের অন্তরের আকুতি ও ব্যাকুলতা আর প্রকাশিত হয় না।

ইন্দ্রিয়জ ভোগ সুখ থেকে মুক্তি লাভ করে, দৈহিক অনুভূতির উর্ধ্বে যেতে চেয়েছেন সাধক পদকর্তা সরহ পাদ। তাই দেহের অস্তিত্ব ও বিলোপের ব্যবধান আর তাঁকে সুখ দুঃখে বিচলিত করে না, পদকর্তা গেয়েছেন ঃ

জইসো জাম, মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো। [পদ সংখ্যা-২২]
(জন্ম যেমন, মরণও তেমনই, জীবন ও মৃত্যুতে কোনও ব্যবধান নেই)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের শ্রীমতীর দেহ-মন কৃষ্ণপদে সমর্পিত, তাই এ দেহ তিনি গ্রহণ না করলে এর ধারণই বৃথা, এ দেহের অবসান হোক, তিনি সব জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করুন ঃ

গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কি বা মরোঁ অনলে পুড়িআঁ
তবে বা মোএঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ
কি বা মরোঁ গরল খায়িআঁ ॥

শবরপাদের নিসর্গ বর্ণনায় পাই ঃ

নানা তরুবর মৌলিল রে—(পদ সংখ্যা-২৮)
(নানা তরু মুকুলিত হ'ল)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবিও বসন্ত সমাগমে একই ভাবে ভাবিত ঃ

'চারি দিগেঁ তরু 		পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ—

ভাব চিত্রের এ মিল ছাড়াও লৌকিক চিত্রাঙ্কণেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। চর্যাপদের সমকালীন সমাজে দিনে গৃহবধূর প্রতি সতর্ক পাহারা। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কোনও সুযোগ সুবিধা তার নাই. তাই বন্দিনী বধূ :

'সাসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই' (পদ সংখ্যা-২)
(শাশুড়ী নিদ্রাগত বধূ জাগ্রত)

একই ভাবে হৃদয়ে প্রেমের আকুতি ও বিরহ জ্বালায় জর্জরিতা শ্রীমতী কুলাচারে বন্দিনী। বড়ু চণ্ডীদাস এ অনুভূতিকে রূপায়িত করেছেন :

তুঅজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন
নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন।

এ ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে উভয়ের রূপ জগৎ ও ভাব জগতে প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ উভয়েরই লৌকিক জগৎ সেকালের নির্যাতিত লাঞ্ছিত নিম্ন শ্রেণীর সমাজ জীবন। 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহায়' পাই অন্ত্যজ শ্রেণীর অভিশপ্ত দরিদ্র জীবন চিত্র আর কৃষ্ণকীর্তনে পাই অমার্জিত গ্রাম্য জীবন যাত্রার জীবন্ত রূপায়ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবন বৈষ্ণব কবিদের বৈকুণ্ঠ বা ভাব-বৃন্দাবন নয়, গয়লাপাড়ার শক্ত, কঠিন বাস্তব ভূমি স্পর্শ করেই কবি তাঁর বাহ্যিক কাহিনীর জীবন চিত্র এঁকেছিলেন।

পরবর্তী কালের বহু কবির কাব্যে আমরা 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহার' ভাব-জগতের প্রতিফলন দেখতে পাই। কারণ তাঁদের মূল ভাবানুভূতি ছিল সেই অপ্রাপনীয়কে পাবার আকুতি, যা যুগে যুগে মানুষের মনে কাব্য ও সঙ্গীতের প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। কুক্কুরী পাদ বলেছেন :

'যা এথু চাহম, সো এথু নাহি। [পদ সংখ্যা ২০]
(এখানে যা দেখি, তা এখানে নাই)

বহু পর যুগে সমভাবে ভাবিত বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

এ ভাব সাদৃশ্য সাধক আত্মার সম আকুতির বহিঃপ্রকাশ। কম্বলাম্বর পাদের পদে পাই :

সোনে ভরিতী করুণা নাবী,
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥ [পদ সংখ্যা ৮]

(আমার করুণা নৌকা সোণায় ভরা, সেখানে রূপা রাখিবার ঠাঁই নাই)

রবীন্দ্রনাথে পাই :

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ তরী।
আমার সোণার ধানে গিয়েছে ভরি॥"

এ মিল কবি ও দার্শনিক আত্মার সুহৃতায়। পদের মূল ভাব ছাড়াও কতগুলি বিষয়ে পরবর্তী বাংলা কাব্যের সঙ্গে চর্যাপদের মিল দেখতে পাই। যেমন রূপক হিসেবে বৃক্ষ, নদী, নৌকা, মাঝি ইত্যাদি পদগুলিকে বার বার ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী কালে বাংলা সর্বপ্রকার ভক্তিসঙ্গীতে এ সকল পদ উপমা ও রূপক অর্থে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখেছি। ভাব জগতের পরিধি পার হয়ে ভাষা ও রচনা শৈলীর ক্ষেত্রে এসেও আমরা পরবর্তী কালের কাব্যের সঙ্গে বহু স্তর অতিক্রান্তি সত্ত্বেও চর্যাপদের ভাষার মিল দেখতে পাই। 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহার' চিত্ত মুসা 'উঞ্চাল পাঞ্চাল', শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাধিকার উত্তাল ভাব তরঙ্গ 'উথাল পাথাল'। বৌদ্ধ গানের সাধকের অজ্ঞানতার গভীরতায় 'নিশি অন্ধারী' আর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পথহারা শ্রীমতীর জীবনে 'আন্ধরী নিশী।' এমন ভাবে বহু শব্দ স্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও স্ব অস্তিত্বে এখনও বাংলা শব্দভাণ্ডারে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছে।

পদে লিঙ্গ ব্যবহারে 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহাতে' অপভ্রংশের রীতিই লক্ষ্য করা যায়। ক্লীব লিঙ্গের প্রয়োগ নেই। বিশেষ্য পদ যদি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হয় তাহলে বিশেষণ স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত হয় এবং অতীত কালের ক্রিয়াতেও কর্তা স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত হলে ক্রিয়াপদে ই, ঈ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়, যেমন : তোহোরি কুড়িআ, হাড়েরি মালী, রাতি পোহাইলী ইত্যাদি। এ রীতি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের

রচনা কালেও প্রচলিত ছিল। যেমন:

'জল লআঁ ঘরে আয়িলী আইহনের রাণী,
তা দেখিআঁ ঈষত হাসিলী চন্দ্রাবলী।

অবশ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী লিঙ্গ ব্যবহারের কোনও বাঁধা ধরা কঠোর নিয়ম নাই। এখন 'সুন্দরী বালিকা' অথবা 'সুন্দর বালিকা' উভয়ের সাক্ষাতই আমরা পেয়ে থাকি।

কর্তায় এক বচন থাকলেও ক্রিয়াপদে বহু বচনের বিভক্তি প্রয়োগ বৌদ্ধ গান ও দোঁহাতে পাওয়া যায়। যেমন কর্তা বহু বচন এবং ক্রিয়াতেও বহু বচনান্ত বিভক্তি যোগের পরিচয় এখানে পাই: 'মূঢ়া অচ্ছন্তে' কিন্তু যখন দেখি 'লড় অচ্ছন্তে' তখন ব্যাকরণের কথা মনে হয়। এখানে কর্তা এক বচনান্ত হ'লেও ক্রিয়াপদে বহু বচনের প্রয়োগ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ক্রিয়াপদ প্রয়োগে ঐ জাতীয় স্থানীয় প্রভাবের ফল এটা। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও ক্রিয়াপদে বহু বচনান্ত বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে অবশ্য সর্বত্রই কর্তা এক-বচন। যেমন: কান্দন্তি গদাধরে, মুছিলান্ত নয়নের পানী, 'কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাত্র' এখানে গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ বলে মনে হয় না। কারণ ওড়িয়াতে ক্রিয়া-পদে এধরণের বহু বচনান্ত প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন 'আপুনি যাউছন্তি' (আপনি যাচ্ছেন)। সুতরাং ক্রিয়াপদে বহুবচনান্ত প্রত্যয় যোগে বিশেষ কোনও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে মধ্যম পুরুষে 'সি' এবং উত্তম পুরুষে 'মি' প্রত্যয়ের ব্যবহার সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেই এখানে ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন: আইসসি যাসি ডোম্বী কাহেরি নাবেঁ' 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ'। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও মধ্যম পুরুষে বর্তমান কালে 'সি' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: 'পাতসি মায়া' তবে উত্তম পুরুষের 'মি' শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 'ওঁ' তে পরিণত হয়েছে। যেমন: যাওঁ, খাওঁ ইত্যাদি। 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহাতে' অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে 'সি' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন:

'সহজ নন্দিনী বনে পইসি নিবিতা'

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে এ ধরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থে 'ই' প্রত্যয়ের প্রয়োগ অবশ্য চর্যাপদে আছে। যেমনঃ 'কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস', এই 'ই' শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 'ইআঁ' হয়েছে। যেমনঃ

'তথা **বসিআঁ** সে দেবরাজ
পুরিল বাঁশীত শরে
নিদ্রাহো **আসিআঁ** চাপিল কাহ্নে,
তেঁসি না বোলা ঘরে।৩

পরবর্তী কালে এই 'ইআঁ' 'ইয়া' তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন বশিআঁ > বসিয়া।

আধুনিক বাংলায় শ, ষ, স, ব্যাকরণগত ভাবে বানান শুদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত হলেও এর উচ্চারণে কোনও তারতম্য নেই। উচ্চারণ নিষ্ঠা থেকে এ বিচ্যুতি চর্যাপদের কালেই আমাদের ভাষায় এসেছে। ফলে পদকর্তারা ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করে উচ্চারণ নির্ভর বানান লিখেছেন অর্থাৎ তিন শ, ষ, স, এর যথেচ্ছ প্রয়োগ সর্বত্র দেখতে পাই। অনুরূপ ভাবে ন, ও ন প্রয়োগের কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। পদকর্তা ইচ্ছা মত এর প্রয়োগ করেছেন যেমনঃ

'**মণ** তরু পঞ্চ ইন্দি তসু **সাহা**।
আসা বহল পাত ফল বাহা।'

এ'ভাবে সুভাসুভ, পুণ, সীস, জাই, জুবাই, জুগতি ইত্যাদি শব্দে বিভিন্ন ভাবে 'য, জ, শ, ষ, এর প্রয়োগ দেখতে পাই। কোথায়ও বা একই শব্দে 'শ,' 'ষ' উভয়ের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমনঃ শবর, ষবরালী' শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের স্তরেও বাংলা ণ, ন 'এর শ,ষ,গ 'জ,য'এর এই যথেচ্ছ প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। যেমনঃ জাএ, আবসি, সাক, বশিআঁ ইত্যাদি। সুতরাং 'ণত্ব' ও ষত্ব' বিধির প্রয়োগ এ স্তরেও বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শুধু শিথিল নয়, ছিল না বললেও চলে।

তৃতীয়া বিভক্তি ও সপ্তমী তে সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তির পুংলিঙ্গের চিহ্ন এন থেকে জাত 'এ', 'এঁ' ইত্যাদি প্রয়োগ চর্যাপদে দেখা যায়। যেমন

মতিএঁ, উএসেঁ, পাএ, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে 'এঁ' থেকে 'এ' র প্রয়োগ দেখি। যেমন: 'ধুলাএ ধুসর', এথাঞিঁ ইত্যাদি।

এক বচন থেকে বহু বচনে রূপান্তরের জন্যে 'আ'কার প্রয়োগ এবং দ্বিত্ব ব্যবহারের রীতি প্রচলিত দেখি। যেমন: মূঢ়া (মূর্খেরা) উচাঁউচাঁ পাবত (উচুউচু পর্বত) সংখ্যা বাচক শব্দ যোগ করেও বহুবচন করা হতো। যেমন: 'পাঞ্চইন্দি', বাংলা সকল প্রকার বিভক্তির প্রয়োগই প্রায় দেখা যায় এবং সমাসেরও সর্ব প্রকার প্রয়োগ লক্ষ্য করি।

বাংলা প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার সে যুগেও প্রচলিত ছিল। যেমন:

'দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাই [পদ সংখ্যা ৩৩]
'জো সো চোর সোহি সাধী [পদ সংখ্যা ৩৩]
আপনা মাংসে হরিণা বৈরী। [পদ সংখ্যা ৬]
'বর সুন গোহালী কিমো দুট্ঠ বলন্দে' [পদ সংখ্যা ৩৯]
'দিবসে বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ [পদ সংখ্যা ২]
রাতি ভইলে কামরু জাঅ'

ক্রিয়াপদ প্রয়োগে নানা প্রকার বাগ্‌ধারা আমরা লক্ষ্য করি যা পরবর্তী কালের বাংলা ভাষায় আমরা প্রচলিত দেখতে পাই। যেমন: সড়ি পড়িআঁ (সড়ে পড়ে), উঠি গেল (উঠে গেল), নিদ গেল (নিদ্রা গেল), অহার কএলা (আহার করলো), গুণিআঁ লেহু (গুণে লই), ধরণ না জাএ (ধরা যায় না), কহন না জাএ (বলা যায় না), ইত্যাদি। বর্তমানে প্রচলিত ভাষায় আমরা ক্রিয়াপদে এ ধরণের বাগ্‌ধারার সঙ্গে প্রচলিত। 'ধরণা জাএ, কহন না যাএ' ইত্যাদি প্রয়োগ পূর্ব-বঙ্গে দৃষ্ট হয়।

রস সৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক মিলনের আকুতি জনিত করুণ রসই প্রাধান্য পেয়েছে। না পাওয়ার বেদনাই প্রায় সর্বত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে শৃঙ্গার রস, অদ্ভুতরস ও শান্তরসের সন্ধানও পাওয়া যায়।

বাংলা গীতি কবিতার আদি উৎসরূপে চর্যাপদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। পদাবলী সাহিত্যের আদর্শ চর্যাপদ। বাংলা ভাষায় রচিত পয়ারের প্রাচীনতম নিদর্শন

চর্যাপদে পাওয়া যায়। চর্যাপদে লঘু পয়ার দীর্ঘপয়ার ও ত্রিপদী, সকল প্রকারের রীতিই দৃষ্ট হয়। চর্যার সমস্ত পদেই অন্ত্যানুপ্রাস লক্ষণীয়।

সংস্কৃত শাস্ত্রের জাতি ছন্দকে উপেক্ষা করে তারা যে এক নতুন পথ গ্রহণ করেছিলেন এ জন্যে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন। এদেঁর জন্যেই বাংলা ছন্দের নিজস্ব রূপ গড়ে উঠলো (সিলেবল এর সংখ্যা অনুযায়ী বাংলা ছন্দের নামকরণ তারা করেছিলেন। যেমন, 'দশাক্ষরা' অক্ষর সমতা সবপদে রক্ষিত না হলেও এই রীতিকে অবলম্বন করেই বাংলা ছন্দের একাবলী, পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদির ভিত্তি গঠিত হয়েছিল।

এ ছাড়া আধুনিক বাংলা কাব্যের সনেটের মতো চৌদ্দ পঙক্তিতে রচিত কবিতা চর্যাপদে পাওয়া যায়। অবশ্য সনেটের আঙ্গিক ও ভাব ধর্মিতার সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য আছে তবুও একে 'চতুর্দশ পংক্তি কবিতা' নামে অভিহিত করতে কোনও বাধা আছে বলে মনে হয়না। কৃষ্ণাচার্য রচিত ১০নং চর্যাপদ এবং শবর পাদের রচিত ২৮নং ও ৫০নং চর্যাপদ চতুর্দশ পংক্তিতে রচিত। অবশ্য অধিকাংশ গানই দশ পংক্তিতে রচিত কোথায়ও কোথায়ও আট চরণও পাওয়া যায়। সুতরাং আঙ্গিক ও মনোধর্মিতায় পরবর্তীকালের গীতি কাব্য রচনার উৎসরূপে বাংলা কাব্য সাহিত্য চর্যাপদের কাছে ঋণী।

নানা প্রকার শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগও চর্যাপদে পাওয়া যায়। যমক, অনুপ্রাস, রূপক, উপমা, স্বভাবোক্তি, অলঙ্কার, কাকুবক্রোক্তি, শ্লেষ অলঙ্কার, বিরোধ ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ চর্যাপদ রচয়িতাদের সূক্ষ্ম শিল্প কর্মের পরিচয় বহন করে। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্য উত্তরাধিকার সুত্রে এ সম্পদ পেয়ে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাস্তব জীবন চিত্রণে এ পদগুলি অতুলনীয়।

হাজার বছরের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করে আমাদের পূর্ব-পুরুষের জীবন বেদনা ও অন্তর সত্যই শুধু আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়নি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক রত্ন ভাণ্ডারের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ভাব, ভাষা ও রূপ পরিবেশনে চর্যাপদের পরবর্তী স্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ

কীর্তনের ভাব ও ভাষা একান্ত ভাবেই লৌকিক ও সর্বজন বোধ্য। এর ধর্মীয় তত্ত্ব বা তথ্য এ কাব্যের রসগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষার সহজ বোধ্যতা একে সর্বজনীন হৃদয়ের আতিথ্য দান করেছে। বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাব ও রূপ-সম্পদে যতোই সমৃদ্ধ হোক না কেন এর রসপরিবেশনের ক্ষেত্র সীমিত; কারণ এর ভাষার দুর্বোধ্যতা। কালের স্তর ভেদ করে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এ ভাষাকে আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয়ের গণ্ডিতে এনেছে এবং বড়ু চণ্ডীদাসের বাঁশী আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মর্মমূলস্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে।

বাংলা ভাষার উষা লগ্নে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের জন্যে যে মুক্তির বাণী বহন করে এনেছিল, আজ সেই বাণীই ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে অপরূপ সুষমাময় বিশাল বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে।